‘মনোবিজ্ঞানীর মুখোমুখি’ উৎসব পত্রিকার এই ধারাবাহিকে আমাদের সমাজে উপস্থিত নানারকম মানসিক সমস্যার সমাধানে মনিপালের কস্তুরবা মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে ডালাস (টেক্সাস), আমেরিকায় কর্মরত, ড ঃ শুভরঞ্জন ঘোষ, এম. বি. বি. এস., এম. ডি. শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়ঃসন্ধির মনস্তত্ত্ববিদ, এর পরামর্শ পাওয়া যাবে।

এবারের শিরোনাম : ‘বেহালায় বদ্ধপাগল’

ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪-৫ ভাগ লোক কোনো না কোনো মানসিক রোগজনিত যন্ত্রণায় কষ্ট পান। এর মধ্যে রয়েছে নানারকমের উদ্বেগ, হতাশা, বিশেষভাবে বললে বাতিক সংক্রান্ত অবসাদ, দ্বিমুখী অশান্তি ইত্যাদি। সমস্ত মানসিক রোগকে বিবেচনা করে ভারতের মোট জনসংখ্যার ওপর একটা পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় যে হিসাবটা এইরকম :
প্রতি ১০০০ জনে ৭৩ জন কোনো না কোনো মানসিক রোগের জন্য চিকিৎসা করিয়েছেন, তার মধ্যে ২.৫ জন সিজোফ্রেনিয়ার রোগী। যদি গত বছরে প্রথম চিকিৎসা শুরু করেছেন এরকম রোগী সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যায় এই সম্ভাবনা শহরাঞ্চলে প্রতি ১০,০০০ জনে ৩ জন আর গ্রামের দিকে ১০,০০০ জনে ৪.২ জন। এই হিসাবের বাইরেও অনেক এইরকম ঘটনা ঘটে যাদের খবর বাইরে আসে না বা নথীভূক্ত হয় না। সে যাই হোক সাম্প্রতিককালে বেহালায় ঘটে যাওয়া পাগলামির ঘটনার পর্যালোচনায় এই পরিসংখ্যান অত্যন্ত জরুরী।
একখন্ড জমি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি পারিবারিক কলহের সঙ্গে বেলা বসুর নিজের মানসিক বিকৃতি যুক্ত হয়ে তঁকে চালিত করেছিল সাত বছরের ছোট্ট ঋককে খুন করতে । বেলাদেবীর স্বামী ও ছেলেকে জেরা করে এবং তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পুলিশকর্তা এস পি গু প্ত বলেছেন, ‘বেলাদেবীর স্বামী রবীন্দ্রনাথ বসু স্বীকার করেছেন যে বেলাদেবী বিকৃতমস্তিস্ক ছিলেন এবং গত আট মাস ধরে জেমস্ লং সরণীতে একজন মনোবিদের কাছে চিকিৎসাধীন ছিলেন। যে কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঋকের শ্বাসরোধ করা হয়েছিল, সেটা একটা শাড়ির পাড়, ১লা ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার বেলাদেবীর বাড়ি থেকে সেটা উদ্ধার করা হয়েছে’। তিনি আরও বলেন, ‘বেলাদেবীর বাড়ি থেকে আরও অনেক বাচ্চাদের জামাকাপড় উদ্ধার করা গেছে । আমরা জানতে পেরেছি যে উনি বাচ্চাদের ব্যাপারে মোহগ্রস্ত ছিলেন এবং বাড়িতে তাদের জামাকাপড় জমিয়ে রাখতেন। ‘আমরা কখোনোই বাবতে পারিনি যে ঋকের ‘বিড়াল দিদা’ এইরকম একটা জঘন্য কাজ করতে পারেন’ বললেন ঋকের শোকসন্তপ্ত দাদু শ্রী রমেন অধিকারী। তিনি আরও জানালেন যে ঋক প্রায়ই বেলাদেবীর বাড়ি যেত এবং ওঁকে ‘বিড়াল দিদা’ বলত কারণ ওঁর অনেক পোষা বিড়াল ছিল।
দেখা যাচ্ছে পুলিশ, ঋকের পরিবার এবং স্থানীয় জনগণ ঋকের হত্যার সম্ভাব্য কারণ নিয়ে একমত নয়। পুলিশের মতে একটা পুরোনো পারিবারিক বিবাদের প্রতিশোধ নিতেই বেলাদেবী ঋককে খুন করেন। রবীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ির লাগোয়া একটা ভৈরবী মন্দির আছে, যেটার ঋকের ঠাকুর্দা সমর নাথ ১৯90 সালে প্রতিষ্ঠা করেন। যখন রবীন্দ্রনাথবাবু তাঁর নিজের বাড়ি আর মন্দিরের মাঝে একটা পাঁচিল তুলেছিলেন, তখন সমরবাবু তাঁকে মন্দিরের জমিতে পাঁচিল তুলতে বারণ করেছিলেন।
২৯শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথবাবু বেলাদেবীকে মনোবিদের কাছে নিয়ে যান । ‘উনি শুচিবায়ু বা বাতিকগ্রস্ততা ও বার বার একই কাজ করে চলার পীড়াদায়ক মানসিক বিকৃতিতে বা একধরনের নেশা (অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিস-অর্ডার, ও সি ডি) এবং এসবের দরুণ ভ্রান্তি ও মোহগ্রস্ততায় ভুগছিলেন । দুটো লক্ষণই এত ভয়ানক যে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি কিছুকাল চিকিৎসার বাইরে থাকেন তাহলে যেকোনো সময়ে তাঁকে উন্মাদ করে তুলতে পারে । আমি ওঁকে তিন সপ্তাহের ওষুধ দিয়েছিলাম কিন্তু উনি তারপরে আর আসেন নি’ জানালেন চিকিৎসক। মনোরোগিদের আত্মহত্যা বা খুনের ঘটনার যতগু লি খবর পাওয়া যায় তার শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা এই ‘ওষুধ ছেড়ে দেওয়া’-র সাধারণ লক্ষণকে দায়ী করেন। বেলাদেবীর মতো এইরকম জটিল অবস্থায় মনোচিকিৎসক তাঁর মানসিক বিকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করতে নির্বাচিত কিছু ‘সেরোটোনিন রি-আপটেক ইনহিবিটোরি’ জাতীয় ওষুধ দিয়েছিলেন । ‘এইরকম রোগীদের মধ্যে একরকম প্রবণতা দেখা যায় যে স্বাভাবিকভাবে যে কাজ তিনি কিছুতেই করতে পারেন না, সেইরকম কিছু কাজ যেন বাধ্য হয়ে করে ফেলেন । এইরকম অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনার মধ্যে এমনকি কাউকে খুন করে ফেলার মতো ভাবনাও ঘোরাফেরা করতে পারে’ বললেন মনোবিজ্ঞানী ‘এঁরা যদি ওষুধ না খান তাহলে এঁদের অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হয়ে পড়তে পারে’। এর সঙ্গে জুড়েছিল বেলার ভ্রান্তি ও মোহগ্রস্ত ভাব, মানে এমন একটা অবস্থা যে তিনি চারপাশের সবকিছুকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। ‘এইরকম মানসিক অবস্থায় মানুষ ভাবতে থাকে যে কেউ তার ক্ষতি করছে আর যাকে সেইরকম শত্রু বলে মনে মনে স্থির করে, তার যে কোনোরকম ক্ষতি করতে পারে । ওষুধ না খেলে বেলাদেবীর মতো এইরকম একজন রোগী তাঁর নিজের পক্ষে এবং আশেপাশের লোকের পক্ষেও একটা সত্যিকারের ভয়ের ব্যাপার’ ব্যাখ্যা করে দিলেন একজন মনোচিকিৎসক যিনি বেলাদেবীকে স্নায়ুরোগের ওষুধ (মনোবিকার নিয়ন্ত্রক) দিয়েছিলেন এবং তাঁর মনোবিকার উপদেষ্টা (কাউন্সেলার) হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, ‘ওঁর আত্মীয়দের কাছে জানতে পেরেছিলাম যে উনি ভালোই ছিলেন’।
একমাসের বেশী সময় ধরে বেলাদেবী এই দুটি বড়ো মানসিক রোগের জন্য কোনো ওষুধ খাননি। চিকিৎসকের মতে ‘এর ফল বিপরীত হতে পারে’, এমনকি খুন বা আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা যেতে পারে। ঋকের খুনের ব্যাপারে মুখ্য অভিযুক্ত বেলা

বসু ও সি ডি-র রোগী ছিলেন এবং স্বভাবে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মহিলা ছিলেন। যে ডাক্তার তাঁকে দেখছিলেন তাঁর কথায় বেলাদেবী একজন আত্মবিশ্বাসহীন মহিলা ছিলেন এবং বাসনপত্র বার বার ধোয়ার বাতিক ছিল। মেট্রোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার বলেছেন 'ওঁর অনিদ্রা এবং অন্যন্য রোগও ছিল। তবে উনি কখোনো আচমকা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন বা কারো সঙ্গে মারামারি করেছেন এমন কথা শোনা যায় নি। তবে ওঁর পক্ষে আগে থেকে পরিকল্পনা করে কিছু করে ওঠা অসম্ভব'।

ও-সি-ডি-র লক্ষণ কি কি হতে পারে ?

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে বার বার একই কাজ করার প্রবণতা বা বাতিক এবং নেশার ঘোরে বা বাধ্য হয়ে অস্বাভাবিক কিছু করে ফেলা অর্থাৎ বুদ্ধিনাশ হওয়া দুটোই দেখা যায় আবার কখোনো কখোনো একটি লক্ষনও দেখা যেতে পারে।

বাতিক (অবসেশন) : বাতিক হল এমন কিছু চিন্তা, ভাবনা বা ইচ্ছা যা ঘুরে ফিরে বার বার মনে আসে এবং নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তিটি এই সব চিন্তার বাইরে যেতে চান বা বুঝতে পারেন যে এইরকম চিন্তভাবনাগুলো বিরক্তিকর, অবাঞ্ছিত এমনকি অর্থহীনও বটে । তা সত্ত্বেও এই ব্যক্তিরা ধুলো-ময়লা, জীবাণু সংক্রমণ এইসব নিয়ে অত্যধিক ভাবেন, সবসময় ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেন । অসাবধানে কাউকে আঘাত করার ভয়েও এঁরা শঙ্কিত হয়ে থাকেন (বিশেষতঃ গাড়ি চালাবার সময়) যদিও বেশীর ভাগ সময়ে নিজেরাই জানেন যে এরকম হতে পারে না। বাতিকের সঙ্গ সঙ্গে নানারকম অস্বস্তিকর ভাবনা, বিরক্তি, অহেতুক সন্দেহ এবং যেকোনো বিষয় ঠিক মতো বা মনের মতো করে করার ইচ্ছে জড়িয়ে থাকে।

মানসিক বাধ্যতা বা নেশা (কম্পালশন) : বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি যে সব কাজ বার বার করে চলেন, প্রায় নিয়মের মতো পালন করেন এবং তার মাধ্যমে নিজের বাতিকপ্রবণতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, সেটাই হল তাঁর মানসিক বাধ্যতা । যেমন ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি অনবরত ধোয়াধোয়ি করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যান যে তাঁদের হাত ফুলে হাজা হয়ে যায় । আগুন নিয়ে ভয় আছে এমন কেউ আবার বার বার দেখেন যে তিনি স্টোভ বা ইস্ত্রীটা বন্ধ করেছেন কিনা । কোনো জিনিস হারাবার ভয় আছে এমন কেউ বার বার গুণে দেখেন মিলছে কিনা। মদ্যপান বা জুয়ার নেশার মতো এইসব নেশা মানুষকে মানসিক আনন্দ দেয় না। বরং বাতিকের দরুণ যে অশান্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য, তার থেকে মুক্তি পেতেই এইসব আচার-বিচারের নেশা পেয়ে বসে।

ও-সি-ডি-র সাধারণ লক্ষণগুলো এইরকম

যেসব বাতিক সাধারণতঃ দেখা যায়	যেসব কাজের প্রবণতা বা নেশা সাধারনতঃ দেখা যায়
ছোঁয়াছুঁয়ি-নোংরা-জীবাণুর ভয়	বার বার ধোয়া
নিজের বা অন্যের ক্ষতি করে ফেলার ভয়	একই কাজ বারে বারে করা
নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার ভয়	বার বার মিলিয়ে দেখা
অবাঞ্ছিত যৌনচিন্তা ও উত্তেজনা	ছোঁয়া
অত্যধিক ধর্মীয় ও নৈতিক ভাবনা	গণনা করা বা জপ করা
নিষিদ্ধ চিন্তা	অনবরত সাজানো বা গোছানো
কোনো কিছু 'মনের মতো' করে পাবার দরকার	সঞ্চয় করা বা মজুত করা
কিছু বলা, জিজ্ঞেস করা বা স্বীকার করার দরকার	প্রার্থনা করা

বাতিক ও মানসিক বাধ্যতার দরুণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক অবসাদ দেখা দেয়, প্রচুর সময় নষ্ট হয়, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, কাজকর্ম ও সম্পর্ক নষ্ট হয়। এই ব্যক্তিরা অনেক সময়ই অনুভব করেন যে তাঁদের বাতিকগুলো কষ্টকল্পিত ও অযৌক্তিক, সত্যিকারের কোনো সমস্যার দরুণ উদ্বেগ নয় ; এই লক্ষণটিকে ক্ষীণ অন্তদৃষ্টিযুক্ত মানসিক পীড়া বলা যেতে পারে। তবে বাতিক ও মানসিক পীড়াজাত আচরণগুলি সবক্ষেত্রেই সমান অসুস্থতার বোধক নয়। কিছু নিয়ম বা আচার, ধর্মীয় রীতি-নীতি দৈনন্দিন জীবনে সুন্দর ভূমিকা পালন করে, এগুলো শুভ। স্বাভাবিক দুশ্চিন্তা, ছোঁয়াছুঁয়ির ও সংক্রমণের ভয় বিশেষ অবস্থায় মানসিক চাপের মুখে পড়ে বেড়ে যেতে পারে (যেমন পরিবারে কেউ অসুস্থ বা মৃত্যুশয্যায় থাকলে)। কিছু ক্ষেত্র স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশী হলেও ততটা ক্ষতিকর হয় না। কেবল যখন এই লক্ষণগুলো বেড়েই চলে, অর্থহীন হয়ে পড়ে, অত্যধিক দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তিতে ফেলে এবং জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে বিঘ্নিত করে, তখনই চিকিৎসার দরকার হয়।

কখন ও-সি-ডি শুরু হয় ?

বাতিক বা শুচিবায়ুগ্রস্ততার এইসব লক্ষণ শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক (৪০ বছরের কাছাকাছি) যে কোনো বয়সের মানুষের মধ্যেই দেখা যেতে পারে । এটা দুঃখজনক যে অনেক সময়ই এই লক্ষণগুলি অনেকদিন পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন থেকে যায় কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই লক্ষণগুলি পুষ্ট হয়। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি গড়পরতা তিন থেকে চারজন ডাক্তার দেখিয়ে এবং নয় বছর সময় নষ্ট করে তবে যথার্থ রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা লাভ করেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একজন ব্যক্তির ও-সি-ডি শুরু হওয়ার সময় থেকে সঠিক চিকিৎসা শুরু হতে হতে গড়ে সতের বছর পার হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এই মানসিক পীড়া ও বিকৃতি অজানাই থেকে যায় ও তার চিকিৎসাও হয় না। এই রোগাক্রান্তদের মধ্যে রোগ গোপন করার প্রবণতা ও অন্তদৃষ্টি অর্থাৎ নিজেকে বোঝার ক্ষমতার অভাব দেখা যায়। অনেক স্বাস্থ্যপরিষেবাই এই রোগের লক্ষণ সম্পর্কে অবহিত নয় এবং যথার্থ চিকিৎসা দিতে অপারগ এমনকি কিছু ব্যক্তির চিকিৎসার সংস্থানও নেই । এটা খুবই দুঃখজনক কারণ সঠিক সময়ে রোগনির্ণয়, সঠিক চিকিৎসা ও ওষুধপত্র পেলে মানুষ এই রোগের যন্ত্রণা থেকে অব্যহতি পেতে পারে এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য সমস্যা তৈরী হবার ঝুঁকিও থাকে না।

ও-সি-ডি কি বংশগত ?

এখনও পর্যন্ত এই রোগের জন্য কোনো জিনকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা যায় নি, তবে গবেষণায় প্রকাশিত যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানসিক বিকারের উদ্ভবের পেছনে জিনের একটা ভূমিকা থাকে । শৈশবে শুরু হওয়া ও-সি-ডি (কখোনো কখোনো খিঁচুনি ইত্যাদি লক্ষনের সঙ্গে মিশে) অনেক সময় পরিবারের মধ্যে পরিবাহিত হয়। ও-সি-ডি রোগীর সন্তানের ক্ষেত্রে এই রোগের সম্ভাবনা একটু বেশী থাকে যদিও ঝুঁকির মাত্রা খুব বেশী নয়। এমনকি যদি কখোনো পরিবারের মধ্য এই রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েও থাকে, কোনো বিশেষ লক্ষণের কথা বলা যায় না। মানে হয়তো মায়ের মধ্য ধোয়ামোছার বাতিক রয়েছে কিন্তু শিশুর মধ্যে নানারকম সংস্কার বা খুটিনাটি নিয়ম মেনে চলার প্রবণতা দেখা গেল ।

ও-সি-ডি হয় কেন ?

যদিও এই রোগের কোনো একটি বিশেষভাবে প্রমাণিত কারণ নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, কিন্তু গবেষণায় জানা গেছে যে মস্তিস্কের সামনের অংশের (অক্ষীয় কর্টেক্স) সঙ্গে ভেতরের (গ্যাংলিয়া তলদেশ) যোগাযোগের বিঘ্ন এই রোগের একটি কারণ। মস্তিস্কের এই গঠনগুলির মধ্যে সেরোটোনিন নামক রাসায়নিক বার্তাবহ কাজ করে। যেসব ওষুধ মস্তিস্কে সেরোটোনিন মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে, তাদের দ্বারা এই উপসর্গের উন্নতি হয়। কর্মরত অবস্থায় মস্তিস্কের ছবিতেও দেখা গেছে যে মস্তিস্কের ও-সি-ডি আক্রান্ত বর্তনীগুলো (সার্কিট) সেরোটোনিন ওষুধের ক্রিয়ায় অথবা বোধ-বুদ্ধি-আচরণ-সংক্রান্ত মনোসমীক্ষণ ও চিকিৎসার পর অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে । যদিও এটা পরিস্কার বোঝা যায় যে সেরোটোনিনের মাত্রা কমে যাওয়া ও-সি-ডি-র একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু এর কোনো পরীক্ষাগার সমর্থিত প্রমাণ নেই । বরং আক্রান্ত ব্যক্তির নিজস্ব উপসর্গের ওপর নির্ভর করে রোগনির্নয় করা হয়। শৈশবে হঠাৎ গলা ভাঙার সঙ্গে ও-সি-ডি-র লক্ষণ প্রকাশ পেলে একটা স্বপ্রতিরোধ ব্যবস্থাও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে, এবং জীবাণুনিরোধক ওষুধে (অ্যান্টিবায়োটিক) কাজ হতে পারে।

ও-সি-ডি রোগগ্রস্তের সঙ্গে (বিশেষতঃ ভয়ঙ্কর বাতিকগ্রস্তদের সঙ্গে) কিরকম ব্যবহার করা উচিৎ ?

মনে রাখা দরকার ও-সি-ডি রোগগ্রস্তরা তাদের নিজেদের কাছে এবং অন্যদের কাছেও ক্ষতিকর যার থেকে একটা গুরুতর শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকি প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও এই রোগীদের
আদালত নির্দেশিত কিছু চিকিৎসা ও বিশেষ ব্যবহার বাধ্যতামূলকভাবে পাওয়া উচিৎ। যদি আপৎকালীন চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে পুলিশের সহায়তায় বা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষণকর্মীদের সহায়তায় এই রোগীদের ন্যূনতম নাগরিক অধিকার যেন রক্ষিত হয়, সেটা দেখা উচিৎ । চিকিৎসার ক্ষেত্র বুদ্ধি ও আচরণবিধি সংক্রান্ত মনঃসমীক্ষণ ও চিকিৎসা এবং ওষুধের

ব্যবহার, দুটোই উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাজ করে। আবার বিশেষ অবস্থায় প্রথমে ওষুধ প্রয়োগ করে উপসর্গগু লোকে নিয়ন্ত্রণ করে তারপর মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা ও-সি-ডি রোগীর চিকিৎসার জন্য শুধুমাত্র সি-বি-টি অর্থাৎ মনঃসমীক্ষণ বা যুগ্মভাবে মনঃসমীক্ষণ ও সেরেটোনিন ওষুধের প্রয়োগ (এস-আর-আই) দুরকম পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকেন। কোন্ পদ্ধতিটি কার্যকরী হবে সেটা রোগীর বয়স ও রোগের প্রাবল্য অনুযায়ী ঠিক করা হয় । রোগীর বয়স কম হলে বা মৃদু উপসর্গের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে মনঃসমীক্ষণকেই কাজে লাগানো হয়, তবে রোগের প্রকোপ বেশী হলে ওষুধের সাহায্য নেওয়া হয় এমনকি বিশেষ অবস্থায় শুধু ওষুধের ওপরও নির্ভর করতে হয়।

চিকিৎসার পদ্ধতি	প্রাপ্তবয়স্ক রোগী		বয়ঃসন্ধির রোগী		প্রাক্‌যৌবনকালের রোগী	
	মৃদু*	আরো তীব্র*	মৃদু	আরো তীব্র	মৃদু	আরো তীব্র
প্রথম পর্যায়	প্রথমে মনোচিকিৎসা	মনোচিকিৎসা +ওষুধ** প্রথমে ওষুধ	প্রথমে মনোচিকিৎসা	মনোচিকিৎসা +ওষুধ	প্রথমে মনোচিকিৎসা	প্রথমে মনোচিকিৎসা
দ্বিতীয় পর্যায়	মনোচিকিৎসা +ওষুধ প্রথমে ওষুধ	প্রথমে মনোচিকিৎসা	মনোচিকিৎসা +ওষুধ প্রথমে ওষুধ	মনোচিকিৎসা +ওষুধ একসঙ্গে	মনোচিকিৎসা +ওষুধ প্রথমে ওষুধ	মনোচিকিৎসা +ওষুধ প্রথমে ওষুধ

* মৃদু উপসর্গ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে ইয়েল-ব্রাউন ও-সি-ডি মাত্রা অনুসারে ১০-১৮, যা যন্ত্রণাদায়ক হলেও অকেজো করে দেয় না, অর্থাৎ রোগীর নিজের কাজটুকু করতে অন্য কারো সাহায্য লাগে না। মাঝারি ধরনের রোগের মাত্রা ১৮-২৯, এতে মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে কিছুটা শারীরিক অক্ষমতাও যোগ হয় । আর ও-সি-ডি তীব্র হওয়ার অর্থ তার মাত্রা ৩০-এর ওপরে, যাতে শরীরিক অক্ষমতা এতটাই বেশী হয় যে অন্যের রীতিমতো সাহায্য দরকার হয়।

** এখানে ওষুধ বলতে বোঝাচ্ছে সেরোটোনিন রি-আপটেক ইনহিবিটর (SRI), নির্বাচিত ওষুধ SSRI

সেরোটোনিন মাত্রা ঠিক করার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের মধ্যে পাঁচরকম যৌগের নাম করা যায় : ক্লোমিপ্রামিন, ফ্লুওক্সেটিন, ফ্লুভোক্সামিন, প্যারোক্সেটিন ও সেরট্রালিন । কখনও কখনও ক্লোমিপ্রামিনটা বাদ দেওয়া হয়।

চিকিৎসার সাম্প্রতিক অবস্থা	সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না	আংশিক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে
যে রোগী মনোচিকিৎসা দিয়ে শুরু করেছেন, তাঁর কখন ওষুধের দরকার হবে	রোগের প্রকোপ কম হলে চার সপ্তাহ মনোচিকিৎসার পর ওষুধ শুরু হবে কঠিনতর ক্ষেত্রে দু-সপ্তাহ মনোচিকিৎসার পর ওষুধ শুরু হবে	রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত মৃদু হলে সাত সপ্তাহ মনোচিকিৎসার পর ওষুধ শুরু হবে রোগের অবস্থা গু রুতর হলে চার সপ্তাহ মনোচিকিৎসার পর ওষুধ শুরু হবে
চিকিৎসা যদি ওষুধ দিয়ে শুরু হয়, তবে কখন মনোচিকিৎসার দরকার	মনোচিকিৎসার আগে চার থেকে আট সপ্তাহ শুধু ওষুধ চলবে	মনোচিকিৎসার আগে চার থেকে আট সপ্তাহ শুধু ওষুধ চলবে
রোগী শুধু মনোচিকিৎসা করাতে চান অথচ ছ'টি পর্যায়ের পরও সাড়া নেই	আরো তিন থেকে ছ'টা পর্যায় দেখা যাবে	আরো চার থেকে দশটা পর্যায় দেখা যাবে
দুই থেকে তিনবার নির্বাচিত সেরেটোনিন প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছে	ক্লোমিপ্রামিন দিয়ে দেখা যেতে পারে	ক্লোমিপ্রামিন দিয়ে দেখা যেতে পারে

কুচিন্তামূলক মানসিক রোগ	প্রথম অবস্থা	দ্বিতীয় অবস্থা
ভীতি ও লোকের সঙ্গে মিশতে অসুবিধা	মনোচিকিৎসা (আগে)+ নির্বাচিত ওষুধ	মনোচিকিৎসা + ক্লোমিপ্রামিন মনোচিকিৎসা + SSRI +BZD* মনোচিকিৎসা + MAOI +/- BZD
অবসাদ	মনোচিকিৎসা	মনোচিকিৎসা (শুধু) মনোচিকিৎসা + MAOI মনোচিকিৎসা + SSRI + BZD
দ্বিমেরু-১ ও দ্বিমেরু -২ (মেজাজ স্থির করার ওষুধে কাজ হবার পর)	মনোচিকিৎসা + মেজাজ স্থির করার ওষুধ মনোচিকিৎসা + মেজাজ স্থির করার ওষুধ +SRI	SRI + মেজাজ স্থির করার ওষুধ
স্কিৎজোফ্রেনিয়া	SRI + স্নায়বিক ওষুধ	মনোচিকিৎসা +SRI + স্নায়বিক ওষুধ
'টরেট-এর' উপসর্গ	মনোচিকিৎসা + SRI + প্রথাগত ওষুধ	মনোচিকিৎসা +SRI + রিসপেরিডোন মনোচিকিৎসা + SRI মনোচিকিৎসা (শুধু)
অস্থিরতা বা ছটফটানি, অতি সক্রিয়তা	মনোচিকিৎসা + SSRI + মানসিক শক্তিবর্ধক	মনোচিকিৎসা + ক্লোমিপ্রামিন + মানসিক শক্তিবর্ধক মনোচিকিৎসা + SRI মনোচিকিৎসা (শুধু)
ধ্বংসাত্মক আচরণ	SRI + মনোচিকিৎসা + পরিবারগত চিকিৎসা SSRI + মনোচিকিৎসা	মনোচিকিৎসা + পরিবারগত চিকিৎসা ক্লোমিপ্রামিন + মনোচিকিৎসা SSRI ক্লোমিপ্রামিন মনোচিকিৎসা (শুধু)

*BZD : বেনজোডায়াজেপাইন ;

হিংস্র ধরনের বাতিকের চিকিৎসা

উগ্র ও হিংস্র চিন্তাভাবনা থেকে মানসিক অস্থিরতা, দুঃস্বপ্ন ও কিছু করে ফেলার বাসনা দুইই জন্মাতে পারে। এই রোগীরা কল্পনা করেন বা মনশ্চক্ষে দেখতে পান যে তাঁরা নিজেদের, তাঁদের সন্তানদের, অন্যান্য পরিজনদের এমনকি পোষ্যদের ধারালো অস্ত্র (ছুরি, কাঁচি, ভাঙা বোতল, কলম ইত্যাদি) দিয়ে আঘাত করছেন, ক্ষতবিক্ষত করছেন, গলা টিপে ধরছেন, বিষপ্রয়োগ করছেন। তাদের মধ্যে এমন ইচ্ছেও তীব্র হয়ে উঠতে পারে যার জন্য তারা নিজেরা গাড়ীর সামনে ঝাঁপ দিতে পারেন, বারান্দা, জনালা বা ওই রকম কোনো উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়তে পারেন এমনকি অন্যকেও ঠেলে ফেলে দিতে পারেন। গাড়ি চালাতে চালাতে এই ব্যক্তিদের ইচ্ছে করে পথচারীদের চাপা দিতে কিম্বা পথের পাশের পাঁচিলে বা স্তম্ভের গায়ে গিয়ে ধাক্কা মারতে এমনকি একদৃষ্টিতে যানবাহনের চলাচলের দিকে তাকিয়ে থাকতে। একজন রোগীকে উড়োজাহাজের একটা দরজা খুলে ফেলার চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছিল। এইসব মনোবিকারের দরুণ রোগীরা নিজেরাই শিশু বা বৃদ্ধদের সঙ্গে (যারা শারীরিকভাবে রোগীর চেয়ে দুর্বল) একা থাকতে ভয় পান, বেশী লোকজনের মধ্যে, ব্যস্ত রাস্তায় বা ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে যেতেও তাঁরা দ্বিধা করেন কারণ তাঁরা সবসময় ভাবেন যে তাঁরা লোকের ক্ষতি করে ফেলবেন। মায়ের মনে বার বার ছেলেমেয়েদের প্রতি হিংস্র আচরণ করে ফেলার চিন্তা ঘুরে ফিরে আসে। এই অবস্থায় যৌনচিন্তার মধ্যেও ধর্ষণ ও যৌননিপীড়নের (এমনকি শিশুদের প্রতিও) ভাবনা এসে থাকে। ফলে রোগীর মনে লোকের সঙ্গে অবাঞ্ছিত বা অশোভন ব্যবহার করে ফেলার ভীতিও জন্মে যায়।
যদিও ঠিক এই পর্যায়ের রোগীর সংখ্যা কেমন তা নিশ্চিৎভাবে বলা যায় না কিন্তু ধারণা হয় যে আমরা যতসংখ্যক বলে মনে করি আসল সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। যখন একজন চিকিৎসা করাতে শুরু করেন তিনি মনে করেন যে তিনি উন্মাদ এবং

চারপাশের লোকজন কল্পনা করতে পারবেন না তিনি কতটা উন্মাদ । তবে যখন সেই ব্যক্তি অন্যদের কাছ থেকেও শোনেন যে তাঁদেরও একইরকম চিন্তাভাবনা আছে তখন সাধারনতঃ তাঁদের বোঝানো যায় যে তাঁদের ধারণাটা ভুল। আরেকটা চিন্তায়ও এই রোগীরা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকেন ; তাঁদের প্রায়ই এই কথা মনে হয় যে 'আমি কিরকম খারাপ লোক যার জন্য আমি এইরকম খারাপ কথা ভাবি !' কিম্বা 'আমি যদি এই কাজ গুলো করতে না চাই তাহলে আমি এই চিন্তাগুলোই বা কেন করি ? তাহলে আমি নিশ্চই একজন বিকৃতমনস্ক'। এই সন্দেহের সমাধান নিজেরা করতে পারেন না বলে এই ব্যক্তিরা একটা প্রচন্ড দুশ্চিন্তায় ভোগেন । আগেকার দিনে যাঁরা ও-সি-ডি-র চিকিৎসার জন্য মনোঃসমীক্ষকের কাছে যেতেন তাঁদের (ভুল ভাবে !) জানানো হত যে এই চিন্তাভাবনা গুলো তাঁদের অবদমিত ক্রোধের প্রকাশ এবং যে তাঁদের মধ্য যে বাতিক দেখা যায় সেটা তাঁদের অবচেতন মনের বাসনার ফল । এই কথা ঐ রোগীদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে উঠত । দুঃখজনক কথা হল এই যে এইরকম ধরনের চিকিৎসা এখনও কোনো কোনো জায়গায় চালু আছে । একটি ঘটনার কথা জানা আছে যেখানে এক মহিলা মনোবিদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর মনে বাচ্চাকে অহেতুক আঘাত করার নেশা বা বাতিক আছে । এর সুফল এটাই হয়েছিল যে সেই চিকিৎসক ঐ মহিলাকে সুরক্ষা সংস্থার সাহায্য নিতে উপদেশ দেন যাঁরা তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটার দিকে নজর দেন এবং বাচ্চাটিকে ঐ বাড়ি থেকে সরিয়ে নেন।

রোগীদের এটা বোঝানো দরকার যে ভাবনাগুলো কেবলমাত্র ভাবনাই, তার জন্য দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বরং ঐসব ভাবনা থেকে যেসব ধারণা রোগীর মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়, সেগুলোই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এই ধারণাটাকে অতিক্রম করা খুব দরকার যে 'আমি যদি এটা ভাবি, এটাই সত্যি হয়ে যাবে'। মনে রাখা দরকার এইসব ভাবনায় যাঁরা কষ্ট পান হিংস্রতা মোটেই তাঁদের স্বভাবগত নয় । যদিও মনোরোগের দরুণ তাঁদের মনে অনেক অসম্ভব এবং অদ্ভুত চিন্তার উদয় হয় কিন্তু সেটা তত ক্ষতিকর নয় যতটা ক্ষতিকর (যেটা আসলে সমস্যার কেন্দ্র) হল এই চিন্তার দরুণ মানুষের মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয়, সেটা । আগেই বলা হয়েছে বাতিক বা নেশাকে প্রশমিত করতে এই মানুষেরা কিছু কিছু কাজ ক্রমাগত করেই চলেন যার থেকে তাঁরা মানসিকভাবে অসার বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এইসব কাজের নেশা এই ভ্রান্ত ধারণায় মানুষকে বিপথে চালিত করে, যেন এই কাজগুলো করে ফেললেই তাঁরা অন্ততঃ কিছুক্ষনের জন্য শান্তি পাবেন । আসল ভ্রান্তিটা হল এই যে কিছু সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে লোকে এই মানসিক বাধ্যতা বা নেশার দ্বারস্থ হন, অথচ কিছুদিন পর এইগুলো নিজেরাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখন এর পেছনে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট হয় । লোকে তাঁদের অবাঞ্ছিত চিন্তা ভাবনাগুলোকে এড়িয়ে চলে তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান, কিন্তু আসলে এতে উল্টো ফল হয় । কারণ যে কোনো ভীতির হাত থেকে ত্রাণ পেতে গেলে তার কারণকে এড়িয়ে চললে চলে না, তাদের মুখোমুখি হতে হয় । এমন হতেই পারে যে একজন মানুষ যেসব জিনিসকে ভয় পান সারাজীবনে সেগুলোর মুখোমুখি হলেনই না বা এত বেশী সময় ধরে তার সংস্পর্শে এলেন না যাতে সত্যিটা জানা হয় । সে যাই হোক এবং রোগের প্রকৃতিটা যেমনই হোক ওসিডি-র যথার্থ চিকিৎসা হল রোগীদের মেনে নিতে হবে যেগুলো তাঁরা নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান বলে মনে করছেন, সেগুলো আসলে সমাধান নয় আর সেই সঙ্গে নিজেদের বাতিকগুলোর মুখোমুখি হয়েই সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । এছাড়া অন্য কোনোভেবেই পুরোপুরি সমাধান সম্ভব নয়।

যে চিকিৎসাপদ্ধতিতে এই নীতিগুলো অনুসরণ করা হয় তার নাম হল 'প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিরোধ' (Exposure and Response Prevention, E&RP) । এটি হল একটি সুসম্বদ্ধ পদ্ধতি যাতে ধাপে ধাপে একজনের হিংস্র চিন্তাভাবনাগুলোর মোকাবিলা করা হয়। এই পদ্ধতিতে রোগীদের সোজাসুজি নানারকমভাবে উত্তেজক ভাবনার প্রভাবাধীন করা হয় । এর মধ্যে কিছু কাজ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তাঁর নিজের দপ্তরেও করা হয়, কিছু রোগীর বাড়িতেও হয়। কোনো ক্ষেত্রেই দৃঢ় বা নিশ্চিৎভাবে কোনো আশ্বাস দেওয়া হয় না বরং রোগীর দুশ্চিন্তাটা উসকে দেওয়া হয় এই বলে যে তিনি যা ভাবছেন সব সত্যি, যা আশঙ্কা করছেন তা ঘটে যেতেই পারে এবং কোনো ভাবেই সেটা আটকানো সম্ভব নয়। সঠিক ভাবে বলতে গেলে যখন দুর্ভাবনাগুলো জন্মায়, তখনই এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ । হিংস্রতার রোগীরা স্বগতোক্তির মতো করে বিচিত্ররকম ভাষ্যরচনা করেন, যেগুলো পরপর বিবেচনা করে কাজ করা যেতে পারে বা তাঁদের বাড়িতে করার জন্য কিছু কাজ দেওয়া যেতে পারে। হিংস্র ভাবনার শিকার যেসব মানুষ তাঁদের ক্ষেত্রে একটা খুব পরিচিত ভাষ্য হল এইরকম যে, 'আমি একজন মানসিক রোগী আর সত্যি সত্যিই এইসব (অপরাধমূলক) কাজ করতে চাই, তাই আমার মনে এইরকম চিন্তাভাবনার জন্ম হয় । একদিন আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এইসব হিংস্রকাজকর্ম করে ফেলব। আমি যদি নিজের ভাবনার ওপর নির্ভর করি তাহলে সারাজীবন আমি এই মানসিকতা থেকে বেরোতে পারব না, আমার এবং আমার পরিবারের সর্বনাশ হয়ে যাবে । আমি যা করতে চলেছি তার জন্য ওরা কষ্ট পাবে আর আমি ওদের ওপর এবং সেই হতভাগ্যের ওপর কি করলাম তাই ভেবে আমি কষ্ট পাব । এই অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি বাঁচতে পারব না, হয় জেলে পচে মরব না হলে আত্মহত্যা করব'।

একটি বিশেষ চিকিৎসাপদ্ধতিতে (যা লেখক পছন্দ করেন) নির্দিষ্ট কার্যাবলীকে এমনভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয় যাতে একজনের ভয়ঙ্কর ভাবনাগুলোকে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও ক্ষতির মাত্রা অনুসারে সাজানো হয় । ন্যূনতম ক্ষতিকর বিষয় থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে অধিকতর ক্ষতিকর ভাবনার চিকিৎসার দিকে এগোনো হয় । তবে সমস্ত ব্যাপারটাই রোগীর সহনশীলতার ওপর নির্ভর করে করা হয়, রোগী সামলাতে পারবেন না এমন কিছু জোর করে করতে বলা হয় না। যদি একটা নির্দিষ্ট কাজ একবারে করে ওঠা সম্ভব না হয়, তবে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে করানো হয় । প্রতিটি (চিকিৎসামূলক) কাজের চরিত্র ও শ্রেণীবিভাগ রোগীর নিজস্ব

উপসর্গের কথা বিবেচনা করেই ঠিক করা হয় । এই চিকিৎসাপদ্ধতি গৃহ-ভিত্তিক (এবং স্ব-পরিচালিতও বটে) । সাপ্তাহিক হিসাবে কাজ লিখিতভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যাতে চিকিৎসকের দপ্তরের বাইরেই কাজ হতে পারে, একমাত্র দরকার হলেই চিকিৎসককে ডাকা যায় । বেশীরভাগ লোকের সপ্তাহে চার থেকে বারোটি কাজ করতে হয় । বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার চিকিৎসা করা হয়, যখন ডাক্তারের সঙ্গে মোটামুটি একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সাক্ষাতে গত একসপ্তাহের কাজের বিচার করা হয়, পরবর্তী একসপ্তাহের কাজ ঠিক করে দেওয়া হয় এবং ঐ ব্যক্তির জীবনযাত্রার অন্যন্য দিকগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়, যদি তার মধ্যে থেকে চিকিৎসার ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র পাওয়া যায়, সেটা বিবেচনা করা হয় ।

আগেই বলা হয়েছে যে এইরকম চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রথমে খুব সাধারণ আর কম ক্ষতিকর উপসর্গ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বিশেষধরণের উপসর্গের দিকে এগোনো হয়। আচরণবিধিমূলক চিকিৎসায় পুঁথিগত বিদ্যার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করলে চলে না। এখানে চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তা ও নমনীয়তার ভূমিকা অনেকটাই । যেখানে যাওয়া দরকার যেতে হবে, চিকিৎসার প্রয়োজনে একজন রোগীর ভাবনাগুলোকে মুক্ত করার জন্য যেরকম পরিস্থিতি দরকার সেটা তৈরী করে নিতে হবে । সাধারণতঃ রোগীকে প্রথমে বলে দেওয়া হয় যে এরকম অনেক লোক আছে যারা কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হিংস্র আচরণ করতে পারে এবং তারপর এটাও বলা হয় বা জানতে চাওয়া হয় যে রোগীও নিজেও হয়তো ঐরকম কিছু করে ফেলতে পারেন । সেখান থেকে আস্তে আস্তে রোগীকে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় যাতে তিনি সত্যি সত্যিই হঠাৎ করে একটা হিংস্র আচরণ করে ফেলেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে রোগী তাঁর বদ্ধ ধারণা বা ভাবনাগুলোর কথা এবং সেগুলো যে যখন তখন ঘটতে পারে, সেকথা প্রকাশ করেন । এই পর্যায়ে রোগীর মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে সন্দেহ জেগে থাকে তাহলে তাঁকে এটাও বলা যেতে পারে যে তিনি এইরকম কোনো কাজ হয়তো অতীতে বা ইদানীংকালের মধ্যে করেছেন। এই সব পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে কয়েকমাস সময় দরকার আর সমস্ত পদ্ধতিটির জন্য মোট ছয় মাস থেকে নয় মাস সময় দরকার । আরো কঠিন এবং ক্ষতিকর সমস্যার জন্য আরো দীর্ঘতর সময়কাল সপ্তাহে একবারের বেশী রোগীর সঙ্গে বসা দরকার । সবচেয়ে কঠিন কিছু ক্ষেত্রে, যদিও সেটা খুব কমই দরকার হয়, রোগী নিজে চিকিৎসায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না ; তখন তাঁকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করতে হয়।

এই ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতির অন্তর্গত একটি বিশেষ কৌশল হল রোগীকে দিনে কয়েব বার কয়েক মিনিট দৈর্ঘের কিছু তথ্য বা বার্তার উপস্থাপনা শোনানো বা বই পড়ানো, যাতে ভয়ানক ধারনাগুলোর কথা বলা হয়েছে । এছাড়া হিংস্র ভাবনাগুলো যে সত্যিকারের ইচ্ছে হতে পারে, সে বিষয়ে স্বল্পদৈর্ঘের রচনা পড়িয়ে, হিংস্র যৌন অপরাধ সম্পর্কিত ওয়েবসাইট দেখিয়ে, দুশ্চিন্তা উদ্রেককারী নানারকম চিহ্ন দেখিয়ে রোগীর অন্তঃস্থ দুর্ভাবনাকে উসকে দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবজীবনের কিছু ঘটনার মতো করে সাজানো ছোটোখাটো নাট্যরূপ অভিনয় করা হতে পারে যাতে ভয়ানক পরিস্থিতিগুলোর মুখোমুখি হওয়া সহজ হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি যুবকের মনে ধারণা ছিল যে তার বাবাকে ছোরা মারতে পারে ; এই যুবকের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা নৈশ পরিবেশ সৃষ্টি করা হল, যখন ছেলেটি তার বাবার সঙ্গে সোফায় বসে টিভি দেখছে, হাতে একটা লম্বা ছোরা। একসময় দেখা যাবে তার বাবা তার দিকে ঘুরে খুব গভীর স্বরে বলছেন, ‘আমায় মেরো না’। এইসব পদ্ধতিতে যে বিষয়টা খুব গুরুত্বসহকারে প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেটা হল রোগীকে বারংবার এইটা বোঝানো যে এড়িয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই, মুখোমুখি হতেই হবে । সম্ভবতঃ সবচেয়ে কঠিন কাজটা হল রোগীকে তার হিংস্র ভাবনাটার সঙ্গে যুদ্ধ না করে এমনকি বিশ্লেষণও না করে সেটাকে সেইভাবেই মেনে নিতে শেখানো।

E&RP যখন প্রথম শুরু করা হয়, লোকে প্রশ্ন করে ‘এভাবে তো আমার মনে আরো খারাপ বোধ আসছে, এটা খারাপ হচ্ছে না তো ?’ তাদের বলতে হবে যে যেটায় ভয় পাচ্ছেন, তার সঙ্গে বাস করতে খারাপ তো লাগবেই, তবে সেটা প্রথম প্রথম, তারপর সহনশীলতা বাড়বে । আর একই বিষয়ে তো আর একই সঙ্গে বিরক্তি আর ভীতি, দুটোই হতে পারে না ! লক্ষ্য হল ব্যাপারটায় রোগীকে পুরোপুরি লিপ্ত রাখা যাতে সারাদিনে বারবার নানাভাবে তাকে চিকিৎসায় আনা যায় । যত ব্যাপক ভাবে চিকিৎসা করা যাবে, তত তাড়াতাড়ি রোগী ভীতিপ্রদ বিষয়গুলোয় অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন আর তত তাড়াতাড়ি ভয়টা থিতিয়ে যাবে। যে সময়ে এই সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হয়, ততদিনে রোগীর দুর্ভাবনার বিষয়গুলো আয়ত্তে চলে আসে, তখন তারা সবচেয়ে দুঃসহ ভাবনাগুলোর মুখোমুখি হয়েও বিচলিত হন না।শুনতে যত সহজ লাগছে গোটা ব্যাপারটা, বিশেষতঃ নিজের হিংস্র ভাবনার মুখোমুখি হওয়া আসলে তত সহজ নয় । তাই আসল কাজ হল রোগীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠা । চিকিৎসা চলাকালীন রোগী হয়তো এমন অনেকের সংস্পর্শে আসতে পারেন যারা এইধরনের আচরণবিধিমূলক চিকিৎসা পদ্ধতি ও তার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সম্যক অবগত নন ; সাধারণ আলোচনামূলক চিকিৎসার থেকে এই চিকিৎসার যে মৌলিক পার্থক্য, তা তাঁদের কাছে আশ্চর্য এমনকি ক্ষতিকরও মনে হতে পারে । সেই কথা শুনে রোগী তার বাড়ির লোকজন এমনকি কিছু চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করেও বিপরীত মত পেতে পারেন এবং চিকিৎসা থেকে সরে আসতে পারেন । তাই রোগীকে জানিয়ে রাখা দরকার যাঁরা এইরকম সম্পূর্ণ বিরোধী মতামত দেবেন তাঁরা এই পদ্ধতিটির ব্যাপারে অবহিত নন ।

কি ধরনের ভাবনা বা উপসর্গের জন্য কিরকম চিকিৎসা দরকার, এখানে তার একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া হল। তবে মনে রাখা দরকার সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত না হয়ে কখোনোই এইসব প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া উচিৎ নয়।

ভাবনা	চিকিৎসা
লোককে গাড়ী চাপা দেওয়া	গাড়ী চাপা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া দুর্ঘটনার খবর পড়া জনবহুল রাস্তা ও দোকানপাটের মধ্য দিয়ে গাড়ী চালানো অন্ধকার রাস্তায় গাড়ী চালানো
ছুরিকাঘাত করা	খাওয়ার সময় অন্যদের দিকে বাসনপত্র তাক করা বাড়ীতে লম্বা ছুরি নিয়ে অন্যদের খুব কাছে বসা
আঘাত করা	জনবহুল রাস্তা দিয়ে হাঁটা ও লোকের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া লোকের পিঠে জোরে চাপড় মারা লোকের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তাদের দিকে (আঘাতসূচক) ভঙ্গী করা চলচ্চিত্রে ছুরিকাঘাতের দৃশ্য দেখা
শিশুদের যৌন নিপীড়ন করা	এইরকম অপরাধ করা ধরা পড়েছে এমন খবর পড়া সর্বসমক্ষে শিশুদের কাছাকাছি থাকা নিজের শিশুসন্তানকে আলিঙ্গন করা বা ধরে থাকা
নিজের সন্তানের ক্ষতি করা	শিশু নিপীড়নের খবর পড়া খোলা জানালার ধারে নিজের সন্তানকে ধরে নিয়ে দাঁড়ানো নিজের সন্তানকে আঘাত বা হত্যা করেছে এমন লোকের কথা পড়া
নিজেকে ছুরিকাঘাত করা	কেমন করে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিজেকে আঘাত করবে, সেটা লিখে ফেলা
জনসমক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা	পকেটে ছুরি নিয়ে জনমধ্যে ঘোরাফেরা করা পকেটে একটা ছুরি নিয়ে 'আপনি নিশ্চয় ক্ষেপে যাবেন' রেকর্ড করা এই কথা শুনতে শুনতে জনমধ্যে ঘোরাফেরা করা জনবহুল প্ল্যাটফর্মে অনেক লোকের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা যারা লোকের মাঝে হঠাৎ ক্ষেপে যায়, তাদের কথা পড়া

রোগীদের হিংস্র চিন্তাভাবনার মোকাবিলা করার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া জেতে পারে

১। অপ্রত্যাশিতের জন্য প্রস্তুত থাকা : হিংস্র চিন্তাভাবনা যখন-তখনই মনে আসতে পারে
২। নিজেকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা না করা : বরং ভাবতে পারা যে সবচেয়ে খারাপ কিছু ঘটতেই পারে হয়তো বা ঘটেও গেছে
৩। নিজের বদ্ধমূল ধারণা, সংস্কার বা বাতিকের সঙ্গে যুদ্ধ না করে বা সেগু লোকে বিশ্লেষণ না করে বরং সেগু লো মেনে নেওয়া
৪। মানসিক বাধ্যতা থেকে কিছু করে ফেল্লে সেটা নিজেই উল্টোপাল্টা করে নষ্ট করে দিতে পারা
৫। এটা মনে রাখা যে নিজের উপসর্গগু লো সামলানোর দায়িত্ব নিজেরই ; অন্যদের না জড়ানো
৬। যদি ব্যাপারটা নিজের আয়ত্তে থাকে, তাহলে দুর্ভাবনার দিকেই যাওয়া ভাল, এড়িয়ে যাওয়া নয়।

একটা পরিচিত ধারণা আছে যে হিংস্র চিন্তা ভাবনা বা ইচ্ছের মোকাবিলা করা অন্যন্য উপসর্গের মোকাবিলা করার চেয়ে কঠিন। এটা পুরোপুরি ভুল । উপসর্গ যাই হোক তার সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব একমাত্র যদি সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা হয় আর সেজন্য যা যা করার দরকার সব রকম সহযোগিতায় রোগী রাজি থাকেন।

এই রোগের উদ্ভব, বেড়ে ওঠা এবং আরোগ্যসম্ভাবনার সমগ্র রূপটি কেমন ?

যদিও ও-সি-ডি সাধারনতঃ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, তবে নানারকম মানসিক চাপ যেমন জীবনযাত্রার পরিবর্তন, সম্পর্কের টানাপোড়েন, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ইত্যাদির কারণে হঠাৎও এই রোগ দেখা যেতে পারে । শতকরা সত্তর ভাগ লোকের ক্ষেত্রে এই উপসর্গগুলি সারাজীবন ধরে একটু একটু করে বেড়ে চলে ; শতকরা পাঁচ ভাগ লোকের ক্ষেত্রে নানা পর্বে এই উপসর্গ দেখা যায় এবং দুটি পর্বের মাঝে আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণ নিরাময় হতে দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীর বয়স বা রোগের উপসর্গের চরিত্রের ওপর এর নিরাময়ের সম্ভাবনা নির্ভর করে না । বরং রোগ নিরাময়ের জন্য দরকার হল উপসর্গের তীব্রতা ও স্থায়ীত্ব কম থাকা এবং রোগের পূর্ণ প্রকাশের আগে স্বাভাবিক থাকা। কিছু লোকের মধ্যে এই রোগের শুধু মানসিক বাধ্যতা বা বাতিকগ্রস্ততার উপসর্গটা দেখা যায়, তারা বাধ্যতামূলক কাজকর্মগুলো করেন না ; এঁরা নিজেদের অসঙ্গত, বিরক্তিকর চিন্তাগুলো ভালো কথা চিন্তা করে ভুলে থাকতে বা চেপে রাখতে চান । এর ফলে কিন্তু মানসিক ক্লান্তি এবং মনঃসংযোগের অভাব দেখা যায় । এছাড়া দুর্ভাবনা, ভীতি, হতাশা (শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রে), আত্মহত্যার প্রবণতা এসব পরিচিত লক্ষণ তো আছেই । এই ব্যক্তিদের পক্ষে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কঠিন, অনেকে বিয়ে করেন না, কর্মক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন আর শতকরা এক ভাগ লোক আত্মহত্যা করেন। মোটের ওপর ও-সি-ডি-র রোগীরা স্বাভাবিক জীবনের পক্ষে একেবারে অক্ষম বা অযোগ্য হয়ে পড়েন। জনতার যে প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে সেটাই দেখিয়ে দেয় মানসিক রোগ মানুষের কাছে একটা কতবড় অবাঞ্ছিত ও ভীতিপ্রদ বিষয়। কিছু ক্ষেত্রে এমনকি একজন মানসিকভাবে অসমর্থ পরিজনের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে উদাসীনতা দেখা যায় ।

বেলা বসু ও তাঁর পরিবার যেভাবে জনরোষের শিকার হয়েছিলেন, তা সাধারণভাবে মনোরোগীদের প্রতি সমাজের আচরণ ও মনোভাবকেই পরতিফলিত করে। যে মানসিক বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা থেকে বেলা বসু এই জঘন্য কাজের দিকে এগিয়েছেন, তাকে লঘু করে দেখা নয়, বরং সামগ্রিকভাবে মানুষের সচেতনতা বাড়িয়ে এই ধরনের কাজকে বন্ধ করাই এই রচনার উদ্দেশ্য ।

ডঃ উতোন মুক্তার রফি (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO -র দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা) বলেছেন সভ্যপদাধিকারী দেশগুলির উচিৎ প্রথাগত হাসপাতাল ভিত্তিক চিকিৎসার থেকে আলাদাভাবে মানসিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ক্রমবর্ধমান মানসিক রোগের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে এই পরিষেবার দ্রুত উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী দরকার । একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ভুটানে মাত্র একজন মনঃচিকিৎসক, বাংলাদেশে ১১৫ লক্ষ লোকের জন্য ৬৫ জন, ইন্দোনেশিয়ায় ২০০ লক্ষের জন্য ৪২০ জন আর ভারতে ১০০ কোটি লোকের জন্য ৩৫০০ জন । ২০০১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO -র দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা ডঃ পুনম ক্ষেত্রপাল বলাছেন প্রতি বছর এক লক্ষ লোক আত্মহত্যা করে আর ২০ লক্ষ লোক আত্মহত্যার চেষ্টা করে । এর থেকে বোঝা যায় এই দিকে কি সাংঘাতিক ঘাটতি রয়ে গেছে, যেটা যথাযথ মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে পূরন করা দরকার । যথাযথ মানসিক স্বাস্থ্য নীতি, যথেষ্ট বিনিয়োগ এবং মানসিকভাবে অসুস্থের প্রতি সমাজের আচরণ সম্পর্কিত আইন-কানুনের পরিশোধনের মাধ্যমে এই উন্নয়ন সম্পন্ন করা সম্ভব।

২০০৩ সালে জেনিভায় WHO -র সমাবেশে আবার মানসিক স্বাস্থ্য নীতির রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক উপদেষ্টা ডঃ বিজয় চন্দ্র বলেন ক্রমবর্ধমান জীবিকার চাপ মানুষের মধ্যে মনোরোগ বাড়িয়ে তুলছে। আর্থিক নিরাপত্তার অভাবের দরুনও অনেকে মানসিক চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে না । ডঃ চন্দ্রও একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে মানসিক রোগের চিকিৎসার ওপর জোর দেন এবং মনস্তাত্বিক ও স্নায়বিক রোগের চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলেন। মানসিক রোগের ব্যাপারে জনগণের সচেতনতা বাড়ানোও তাঁর মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ভারত সরকারের মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জাতীয় উপদেষ্টা ডঃ ডি এস গোয়েল বলেছেন, গুরুতর মনোরোগ যেমন স্কিৎজোফ্রেনিয়া, হতাশা ইত্যাদি পুরুষ-মহিলা-কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে একটা বিরাট সংখ্যাক লোককে প্রভাবিত করে এবং অনেক সময়ে আত্মহননের পথেও নিয়ে যায়। এর পেছনে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া, শহুরে আগ্রাসন, কাজের সন্ধানে যুবকদের গ্রাম থেকে শহরে আসা ইত্যাদি অনেক কারণই লুকিয়ে আছে। ডঃ গোয়েলের মতে দশম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় মানসিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনার খাতে বিনিয়োগ দশগুণ বৃদ্ধি করা দরকার (১৫০-২২০ কোটি)। জেলাগত মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ, বর্তমান কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে মানসিক চিকিৎসা বিভাগ খোলা, এই দিকগুলোয় তিনি জোর দেওয়ার কথা বলেন।

সুতরাং ভারতে ক্রমবর্ধমান মানসিক রোগের প্রকোপের ব্যাপারে একমত হলে প্রশ্নটা থেকেই যায় যে আমরা এই রোগীদের সঙ্গে যথাযথ (অবর্বরোচিত পদ্ধতিতে) ব্যবহারে কতটা প্রস্তুত ?

বি. দ্র. : এই প্রবন্ধটি উৎসব পত্রিকার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরে এমন নয়। তবে এটি মানুষকে মনোরোগ ও মনোরোগীদের বিষয়ে অধিকতর শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে একটি প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত রূপ।

অনুবাদক :- ড : রূপালী গঙ্গোপাধ্যায় (গবেষক, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স)